ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৫

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৫

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর : যায়েদ আলতাফ

সম্পাদক : ইমরান রাইহান

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৩০, US $ 20, UK £ 17

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-2-0

Mongol o Tatarder Etihas
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

আল্লাহর দিনকে যারা প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ী করতে চায়, সে-সকল মুসলিমকে।

মহান আল্লাহর কাছে তাঁর উত্তম নামসমূহ ও সুমহান গুণাবলির অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়—'সুতরাং যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।' [সূরা কাহাফ : ১১০]

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

প্রকাশকের কথা

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবির তৃণহীন মরুভূমি থেকে আকাশ আঁধার করে আসা সর্বনাশা ঝড়ের কালো ছায়া পড়েছিল শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও উম্মাহর ঐক্যের কেন্দ্র বাগদাদে স্থিত আব্বাসি খিলাফতের ওপর। কিন্তু বিতর্কপ্রিয় অচেতন জনগোষ্ঠীর কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে দিন। সতর্ক হয়নি সে ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য। একসময় সেই ঝড় প্রচণ্ড আকার ধরে আছড়ে পড়ে খাওয়ারিজমের ওপর এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে শক্তিমান ও সমৃদ্ধ এই সাম্রাজ্য; কিন্তু খাওয়ারিজমের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হওয়ার গরজ অনুভব করেনি পাশের বাগদাদ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। মোঙ্গল ও তাতার নামক সেই প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিশাল খিলাফতে আব্বাসিয়া। মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাস, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। রক্তের স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে দারুল খিলাফা বাগদাদ। ফেলে দেওয়া গ্রন্থের কালিতে কালো হয়ে যায় দিজলা ও ফুরাত। জীবিতরা আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে মিসরের দিকে—মামলুক সুলতানের আশ্রয়ে।

মানুষ মনে করেই নিয়েছিল, তাতারঝড় একটা খোদায়ি গজব; কিয়ামতপূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী। কেউ কেউ ভাবছিল এরা দাজ্জালের বাহিনী; তাই মানুষের সাধ্য নেই এই ঝড়ের মোকাবিলার। মুসলিমবিশ্বের ওপর বয়ে যাওয়া এ তাণ্ডব দেখে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল ইউরোপও। হ্যারল্ড ল্যাম্বের ভাষায়, 'সুইডেন আর ভেনিসের জেলেরা তাতারদের ভয়ে সাগরে মাছ ধরার নৌকা ভাসাতে ভয় পেত!'

জাতিকে রক্ষার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার, যার মধ্যে থাকবে জিহাদের পূর্ণ জজবা। তার ইমান হবে পাথরের চেয়ে কঠিন ও দৃঢ়, সাহস থাকবে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু; আর জাতির প্রতি প্রেম ও দরদে হৃদয়টা থাকবে সাগরের চেয়ে বিশাল ও গভীর। সেই ক্রান্তিকালে মহান আল্লাহ মামলুক সুলতানদের থেকে বাছাই করে নিয়েছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ নামের এক মুজাহিদকে, যিনি ইমান ও জিহাদের মাঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন ধূমকেতুর গতি নিয়ে। আইন জালুতের মহারণে চির-অজেয় আখ্যা পাওয়া তাতারদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর স্বপ্নের আকাশে উদিত হয়েছিলেন ধ্রুবতারা হয়ে। পালটে দেন ইতিহাসের মোড়। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে মুসলমানদের গৌরবময় হারানো অতীত।

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় দেখে নিতে হয় অতীতের উত্থানের কারণ, পতনের প্রধান নিয়ামক। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনুসরণ করতে হয় সেই উত্থানের মাধ্যমগুলোর এবং পরাজয় থেকে বাঁচতে হলে পরিহার করতে হয় পতনের কারণসমূহ। এমনই এক ইতিহাস হচ্ছে মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস আর মামলুকদের উত্থান।

মানবতার সেই ট্রাজেডি আর উত্থান নিয়ে যুগের বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি লিখেছেন গবেষণাধর্মী অনবদ্য এক ইতিহাসগ্রন্থ। গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে আমাদের প্রকাশিত ইতিহাসের গ্রন্থতালিকায় এবার সংযোজিত হলো *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* নামে। এটি ড. সাল্লাবির 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ' সিরিজের পঞ্চম সিরিজ।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি যথেষ্ট কঠিন আর দুর্বোধ্য। এই দুঃসাধ্য কাজটি করেছেন যায়েদ আলতাফ। যথেষ্ট সাবলীলভাবে তিনি প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন। ড. সাল্লাবির অনুকরণে *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ : দ্য ব্যাটালিয়ন* নামে গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এখন থেকে দ্বিতীয় খণ্ডটি *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড) নামেও পরিচিত হবে। আর এখন আপনাদের হাতে তুলে দিলাম গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড—*মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* নামে।

যায়েদ আলতাফ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযোজন করে ফাইল জমা দিলে প্রুফের প্রাথমিক কাজ করেন মুতিউল মুরসালিন। এরপর গ্রন্থটির তথ্যগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করতে এবং প্রয়োজনে সংযোজন-বিয়োজন করতে ইমরান রাইহান দায়িত্ব নেন। এর কারণ হলো, ইতিমধ্যে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, গ্রন্থটির বিভিন্ন নামের উচ্চারণে ভুল আছে, তথ্যে বিভ্রাট আছে এবং প্রায় নাম—উৎসগ্রন্থ, লেখক, স্থান ইত্যাদি—লেখক এত সংক্ষিপ্তভাবে বা ইশারায় লিখেছেন যে, বাংলাভাষী পাঠক-গবেষকদের কাছে অনেক বিষয় অস্পষ্ট থেকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

যাইহোক, ইমরান রাইহান বেশকিছু জায়গা চিহ্নিত করেন, যেগুলোতে সংযোজন-বিয়োজন বা প্রয়োজনীয় টীকা লাগিয়ে দেওয়া দরকার। এদিকে একটা মৌলিক গ্রন্থে এরকম সংযোজন-বিয়োজন কতটা নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে, সে প্রশ্নও সামনে আসে। এই হিসেবে ইমরান ভাইয়ের পরামর্শে মূল লেখককে বিষয়টি অবগত করি যে, 'গ্রন্থটির অনুবাদে আমরা সংযোজন-বিয়োজন করতে চাই।' লেখক খুশি হয়ে আমাদের অনুমতি দেন। এবার আমি আর ইমরান ভাই শুরু করি সংযোজন-বিয়োজনের কাজ। দীর্ঘ সময় নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কাজটি সমাপ্ত করি। এরপর অনুবাদক বিভিন্ন নামের ইংরেজি সংযোজন করে দেন ব্র্যাকেটের মধ্যে। পরে আবদুল্লাহ আরাফাত প্রায় দুই মাস রাতদিন একাকার করে প্রতিটি ইংরেজি বানান ও উচ্চারণের বিশুদ্ধতা যাচাই করে দেন।

যে কথাটি আবারও বলছি, গ্রন্থে ব্যক্তি বা জায়গার নামগুলো বেশ কঠিন ও দুর্বোধ্য। আমরা এখানে প্রত্যেকটি নামের সঠিক বানান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি এবং বিভিন্ন রেফারেন্স ও ইতিহাসের গ্রন্থাদি ঘেঁটে অধিকাংশ নামের শুদ্ধরূপটা খুঁজে বেরও করেছি। তবে বিপত্তিটা বাধে উচ্চারণের ক্ষেত্রে। মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাসের নামগুলো হয়তো মঙ্গোলিয়ান ভাষায় বা চীনা ভাষায় অথবা তাদের কোনো উপজাতীয় ভাষায়, যার সঠিক উচ্চারণ আমাদের জন্য বের করাও কষ্টকর; ভাষার দুর্বোধ্যতা ও ভাষাগুলো আমরা না জানার কারণে। এই হিসেবেও আমাদের কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

টীকার ব্যাপারে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি; আর সেটি হচ্ছে, রেফারেন্সগ্রন্থ আর পৃষ্ঠানম্বর পাশাপাশি একই হলে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি রেখেছি। গ্রন্থটি যেহেতু দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তাই মূল গ্রন্থের ভূমিকাও আমরা উভয় খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছি। কলেবর আর বাহুল্য বিবেচনায় সাইফুদ্দিন কুতুজ গ্রন্থের ভূমিকা এই খণ্ডে রাখিনি, যেহেতু এটি দ্বিতীয় খণ্ডে আছে।

যাইহোক, এত এত মানুষের রাতদিনের পরিশ্রমের পরও আমরা আমাদের কাজকে শতভাগ বিশুদ্ধ দাবি করতে পারি না। যেকোনো ধরনের ভুল হতে পারে, থেকে যেতে পারে। মানুষ হিসেবে আমরা অপারগতা আর দুর্বলতা স্বীকার করছি। তবে আমরা আমাদের চেষ্টায় যে কোনো ত্রুটি করিনি, আশা করি সেটা আপনাদের বোঝাতে পেরেছি। কিন্তু কতটুকু সফল হয়েছি, সেই বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ সেপ্টেম্বর ২০২১

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের ইমান ও ইসলামের দৌলত দান করেছেন, তাওহিদ ও রিসালাতের অনুসারী বানিয়েছেন। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলে আরাবি ﷺ-এর ওপর, যিনি অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমাদের বের করে এনেছেন। তাঁর মহান সাহাবি ও তাবিয়িগণের ওপরও রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস মূলত বিশ্বখ্যাত ইসলামি ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির *দাওলাতুল মুগুল ওয়াত তাতার বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। এটি 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ সিরিজ'-এর পঞ্চম গ্রন্থ। মূল আরবি গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে সাজদায়ে শোকর আদায় করছি।

একাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু, তারপর ৩০০ বছরেরও বেশি সময় মুসলিমবিশ্বের পূর্বাঞ্চল বহিঃশত্রুর এমন ভয়াবহ বিপদ ও আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, যার ফলে ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম জনপদ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পশ্চিমের খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা প্রথম বড় বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তারা আরববিশ্বের ইনতাকিয়া, বায়তুল মাকদিসসহ অন্যান্য অঞ্চল দখল করে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানরা এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করে দ্রুত তাদের প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের ওপর এক ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে তাদের হাত থেকে বায়তুল মাকদিসসহ বেশ কিছু কেল্লা ও দুর্গ ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। তবে তখনো কিছু অঞ্চল তাদের দখলে থেকে যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মিসর মুসলমানদের প্রতিরোধযুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ক্রুসেডাররাও মিসর দখলের চেষ্টা করতে থাকে।

ইতিহাসের ঠিক এই সময়ে এসে মুসলমানদের ওপর আরেক মহাবিপদ নেমে এসে। এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গলরা আত্মপ্রকাশ করে। তারা ছিল মুসলমানদের জন্য 'খোদার গজব' স্বরূপ। চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে তারা একের পর এক রাষ্ট্র দখল করতে থাকে।

চীন, মধ্য এশিয়া ও মুসলমানদের খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য তারা জয় করে ফেলে। এশিয়া মাইনরে সেলজুক সাম্রাজ্যও তাদের হাতে চলে যায়। তারপর তারা ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে অভিযান চালায়। ইরানে ইলখানি শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

মুসলমানরা যদি ঘুমিয়ে না থাকত, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভাই ভাইয়ের রক্তপাত ঘটিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে না থাকত, তাহলে মোঙ্গলরা এত দ্রুত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারত না। খ্রিষ্টানদের পক্ষে অবশ্য মোঙ্গলঝড়ের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তাই তারা গিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মেলায়। হালাকু খান তাদের সঙ্গে নিয়েই মুসলমানদের ধ্বংসের ষোলোকলা পূর্ণ করে। বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটায়।

ইতিহাসের পাতায় যদিও মোঙ্গলরা বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তবে এ ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের সমপর্যায়ের ছিল না। কেননা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিম অঞ্চল পদানত করতে মোঙ্গলদের ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তাদের মূল অস্ত্র। এটি তাদের রক্তে মেশা ছিল। তারা মূলত ছিল কাপুরুষের জাতি। কোনো অঞ্চলের সঙ্গে নিরাপত্তাচুক্তি করে সেখানে প্রবেশ করত, তারপর তা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। যারা আত্মসমর্পণ করত, তাদেরও তারা হত্যা করত।

খ্রিষ্টানরা এই বর্বরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। তাদের সেই স্বপ্ন যখন পূরণ হতে চলছিল, ঠিক তখনই মিসরের মামলুকরা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে আইন জালুতের যুদ্ধে এই মামলুকদের কাছেই মোঙ্গলরা এমন মার খায় যে, পরে তারা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের কোমর ভেঙে যায়।

হিজরি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী মোতাবেক খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, এই বর্বর মোঙ্গল ও তাতারদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমবিশ্বের ওপর দিয়ে বইয়ে দেওয়া তাদের ধ্বংসাত্মক ঝড়।

কোনো সভ্য দেশ ও জাতির ওপর অসভ্যদের হামলে পড়া যদিও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে একটি অসভ্য জাতির স্বল্প সময়ে এত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা এবং তা গড়তে গিয়ে বহু জনপদ, দেশ, রাষ্ট্র ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা সত্যিই অস্বাভাবিক। শুধু অস্বাভাবিক নয়, রহস্যেরও। কত বড় বড় সেনাপতির আগমন ঘটল, যাদের গ্রেট উপাধি দেওয়া হয়েছিল, তারা কেউ যা পারেনি; মূর্খ ও বর্বর চেঙ্গিস খানের পক্ষে তা কীভাবে সম্ভব হলো! সে কীভাবে চীন, ইরান, মা-ওয়ারাউন নাহার, এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত বিশাল এক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করল? মুসলমানরা তখন কী করছিল? হাজার হাজার মাইলের ইসলামি সাম্রাজ্যে তাদের মোকাবিলা করার মতো একজন লৌহমানবও

কি ছিল না? বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত নির্মোহভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং মোঙ্গলদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এবার গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গে আসি। আমার কাছে মনে হয়েছে ইতিহাসের অন্য যেকোনো গ্রন্থের চেয়ে মোঙ্গলদের ইতিহাসগ্রন্থ অনুবাদ করা দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। এর পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের ইতিহাস, ভাষা ও অঞ্চল সম্পর্কে আমার তেমন জানাশোনা না থাকা। সেই সঙ্গে তাদের সঠিক ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছেই। এ জন্য মূল গ্রন্থে উল্লেখিত বিভিন্ন গোত্র, জাতি, অঞ্চল ও দেশের নাম বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে তুলে আনতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। মূল অনুবাদের পাশাপাশি এগুলোর পেছনেও যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে।

বিদেশি ভাষার মধ্যে যেহেতু আমার শুধু আরবি, ইংরেজি ও উরদুটা জানা, তাই এসব ভাষায় মোঙ্গল ও তাতারদের ওপর রচিত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করে অনেক তথ্য নিরীক্ষণ করতে হয়েছে। মানচিত্র সামনে রাখতে হয়েছে। তারপর কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সঠিকটা নির্বাচন করতে হয়েছে। বিশেষ করে আবদুল্লাহ আরাফাত ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। অনেক ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তার জীবনকে নির্ভুল করে দিন।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি, সাম্রাজ্য, স্থান, অঞ্চল, নদী, পর্বত, দুর্গ ও স্থানের বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ উল্লেখ করার পাশাপাশি টীকায় সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; যাতে পাঠকের জ্ঞানসত্তা একটু হলেও পরিতৃপ্ত হয়। কেউ অধিক পরিতৃপ্ত হতে চাইলে তার জন্য ইংরেজি শব্দটা দিয়ে ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে।

অনুবাদে যাতে কোনো অংশ বাদ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। কিছু স্থানে লেখকের বক্তব্য পরিমার্জন করে সঠিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে মহাবীর সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য। যেহেতু তিনি অনারব ছিলেন, তাই অনেক আরব ইতিহাসবিদ তাঁর প্রতি সুবিচার করেননি। কলমের আঁচড়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থের লেখকও তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদানে কার্পণ্য করেছেন বলে মনে হলো। তবে সুলতানের যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে, সেটাও আমরা অস্বীকার করছি না।

কোথাও কোথাও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করা হয়েছে। শুধু শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ না করে এর মর্মে পৌঁছার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজন-বিয়োজনও করা হয়েছে। তারপরও আমরা জোর দিয়ে বলতে পারছি না যে, শতভাগ উত্তীর্ণ হতে পেরেছি, সম্পূর্ণ নির্ভুলরূপে গ্রন্থটি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। আমাদের যারা ভালোবাসেন, কালান্তরকে যারা ভালোবাসেন, সবার কাছে অনুরোধ থাকবে,

আমাদের দুর্বলতাগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আরও পরিমার্জিত সংস্করণ আপনাদের উপহার দেওয়ার সুযোগ দেবেন।

অনুবাদ ও অনুবাদপরবর্তী এই যে এতগুলো ধাপ, এগুলো পার করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি কালান্তরের প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের অনুপ্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা সঙ্গে না থাকত। আমার জানামতে খুব কম প্রকাশকই আছেন, যারা শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রকাশনী থেকে কোনো গ্রন্থ প্রকাশের আগে গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ পড়ে দেখেন। জায়গায় জায়গায় প্রশ্ন তোলেন। তাঁর এই গ্রন্থসচেতনতা সত্যিই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আশা করি, কালান্তর থেকে প্রকাশিত ড. সাল্লাবির 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ সিরিজ'-এর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও আপনাদের কাছে প্রত্যাশাতীত সমাদর পাবে। আল্লাহ আমাদের সবার কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

যায়েদ আলতাফ
সাভার, ঢাকা-১৩৪০
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৯

প্রথম অধ্যায়

মোঙ্গলীয় মিশন ও মুসলিমবিশ্বে মোঙ্গল আগ্রাসন # ২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গল ইতিহাসের সূচনা # ২৯

এক : মোঙ্গল-ইতিহাস অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৯
দুই : মোঙ্গলদের পরিচয় ৩৩
তিন : মোঙ্গলদের আদিবাস ৩৫
চার : যেসব জাতি ও জনগোষ্ঠী মিলে মোঙ্গলসমাজ গঠিত ৩৬
১. তুর্কি জাতিসমূহ ৩৬
২. অ-তুর্কি জাতি ৩৮
পাঁচ : মোঙ্গলদের সামাজিক জীবন ৪১
১. মোঙ্গলদের খাবার ৪৩
২. মোঙ্গলদের পোশাক-পরিচ্ছদ ৪৩
ছয় : মোঙ্গলদের ধর্ম ৪৩
সাত : চেঙ্গিস খানের আবির্ভাবের পূর্বে মোঙ্গলদের সামাজিক অবস্থা ৪৮
১. মঙ্গোলিয়ায় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ৪৮
২. বিচ্ছিন্ন মোঙ্গল জনগোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ৪৯
আট : মোঙ্গল আগ্রাসনের সময় মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ৫১
১. ইসমাইলি বাতিনি ফিরকা ৫৪
২. আব্বাসি খিলাফত ৫৭
৩. মিসর ও শামে আইয়ুবি শাসনের অবস্থা ৫৯
৪. মুসলিম জাহানে ধ্বংসাত্মক পাপাচার ও অবাধ বিকৃতাচার ৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব # ৬৮

এক : জন্ম ও বেড়ে ওঠা ৬৮
১. চেঙ্গিস খানের মায়ের সংগ্রাম ৬৯
২. তেমুজিনের (চেঙ্গিস খানের) চোর দমন ৭০
৩. তেমুজিনের বিয়ে ও কিরায়েত শাসকের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি ৭২
দুই : মোঙ্গালনেতা হিসেবে 'খান' উপাধি ধারণ ৭৩
তিন : নাইমান সাম্রাজ্য এবং তাদের চেঙ্গিস খানের বশ্যতা স্বীকার ৮২
চার : মোঙ্গাল সাম্রাজ্য গঠন ৮৪
পাঁচ : চেঙ্গিস খানের শাসনামলে মোঙ্গালীয় মিশনের উপাদানসমূহ ৮৯
১. চেঙ্গিস খানের ব্যক্তিত্ব ৮৯
২. *আল-ইয়াসা* নামক রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন ৯৯
৩. রাজপরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব বণ্টন ১১১
৪. মোঙ্গালদের রণকৌশল ও বিজিতদের সঙ্গে তাদের আচরণ ১২০
৫. অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ১২৩
৬. একজন চীনা দার্শনিক ১২৪
৭. রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে 'কুরিলতাই' নামে সাধারণসভা ১২৭
৮. মোঙ্গালদের রণকৌশল ও সমরনীতি ১২৯
৯. মোঙ্গালদের সামাজিক ঐতিহ্য, আচার ও রীতিনীতি ১৩২
১০. মোঙ্গালদের বিয়ে ১৩৩
১১. মোঙ্গালদের অলীক বিশ্বাস ১৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোঙ্গালদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন # ১৩৭

এক : খাওয়ারিজমের সুলতানগণ ১৩৭
দুই : খাওয়ারিজম ও আব্বাসি খিলাফতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ১৪০
তিন : খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে মোঙ্গাল আগ্রাসনের কারণ ১৪৩
১. পূর্ব-এশিয়ার মানুষদের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ১৪৪
২. অব্যাহত যুদ্ধাভিযানের মানসিকতা ১৪৪
৩. খাওয়ারিজমশাহের সঙ্গে চেঙ্গিস খানের বাণিজ্যিক চুক্তি ১৪৫
৪. উভয় সাম্রাজ্যে বণিকদের যাতায়াত ১৪৭
৫. বণিক কাফেলার সদস্যদের হত্যা ও তাদের পণ্যসামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ ১৪৯
৬. সংকট নিরসনে মোঙ্গালদের কূটনৈতিক তৎপরতা ১৫১

চার : মা-ওয়ারাউন নাহার ও অনারব ইরাকে মোঙ্গলদের আগ্রাসন ১৫৪
১. মা-ওয়ারাউন নাহার ১৫৪
২. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল দখল এবং মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহের মৃত্যু ১৬৮
৩. খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ওপর মোঙ্গলদের আধিপত্য ১৭৬
৪. খোরাসান দখল ১৮৩
৫. গজনি (Ghazni) দখল ১৯১
৬. সুলতান জালালুদ্দিনের শেষ পরিণতি ১৯৬
পাঁচ : খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ ২০৬
১. সভ্যতা বিনির্মাণে খাওয়ারিজমিদের ব্যর্থতা ২০৮
২. শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা ২০৯
৩. খাওয়ারিজম-পরিবারের আত্মকলহ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ২১১
৪. দুর্বল সমরনীতি ২১৫
৫. পার্থিব মোহ ও মৃত্যুর প্রতি অনাসক্তি ২১৮
৬. বিভক্তি-বিভাজন ও অন্যায়-অবিচার ২২১
৭. সুলতান আলাউদ্দিন খাওয়ারিজমশাহর মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় ২২৭
৮. মাংবুরনির ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ২২৮
৯. আব্বাসি খলিফা নাসির লি-দিনিল্লাহর অদূরদর্শিতা ২২৯
১০. আলিমদের অবমূল্যায়ন ২৩২
১১. মোঙ্গলদের মিশন ২৩২
ছয় : চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ২৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতন # ২৩৭

চেঙ্গিস খানের শাসকবর্গ # ২৩৯

এক : চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য বণ্টন ২৩৯
দুই : ওগেদাইকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধিপতি নির্বাচন ২৪০
তিন : মুসলিম সাম্রাজ্যে মোঙ্গলদের অব্যাহত আক্রমণ ২৪২
১. চীনের উত্তরাঞ্চল জয় ২৪৬
২. ইউরোপ অভিযান ২৪৭
৩. ওগেদাইয়ের মৃত্যু ২৪৮
৪. ওগেদাইয়ের সংস্কার ও শাসনব্যবস্থা ২৪৯
৫. মুসলিম প্রজাদের সঙ্গে ওগেদাইয়ের আচরণ ২৫০

৬. ওগেদাইপুত্র গুয়ুক খান (৬৪৪-৪৭ হিজরি—১২৪৬-১২৪৯ খ্রিস্টাব্দ) ২৫২
৭. গুয়ুক খানকে মোঙ্গল সম্রাট নির্বাচন ২৫৩
৮. মোঙ্গল সম্রাট হিসেব মোংকে খানের অভিষেক ২৫৬
চার : হালাকুর হাতে শিয়া ইসমাইলিদের বিনাশ ২৬৩
১. ইসমাইলি দুর্গের উত্থান ২৬৪
২. শিয়া ইসমাইলিদের মূলোৎপাটন ২৬৬
পাঁচ : হালাকু খানের বাগদাদ অভিযান ২৬৭
১. বাগদাদ আক্রমণ ২৬৭
২. বাগদাদ অবরোধ ২৭১
৩. সংলাপ প্রচেষ্টা ২৭৩
৪. বাগদাদ দখল ২৭৬
৫. খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর হত্যাকাণ্ড ২৭৮
৬. সভ্যতার বিনাশ ২৮০
৭. বাগদাদের শাসক হিসেবে মুআইয়িদুদ্দিন আলকামি ২৮৫
৮. ইরাকে হালাকুর ইলখানি শাসন ২৮৬
৯. হালাকুর কাছে শাসক ও প্রশাসকদের আগমন ২৮৯
ছয় : আব্বাসি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ও শেষ খলিফা মুসতাসিম ২৯০
সাত : আব্বাসি খিলাফত পতনের প্রধান কারণসমূহ ২৯৩
১. প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব ২৯৭
২. জিহাদের ফরজ বিধানের প্রতি অনীহা ৩০০
৩. মুসলিমবিশ্বে রাজনৈতিক অনৈক্য ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ৩০২
৪. সামরিক দুর্বলতা ৩০৬
৫. দুর্বল রাষ্ট্রীয় মনোভাব ৩০৮
৬. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরণ ৩১০
৭. অঙ্গরাষ্ট্রের প্রশাসকদের হীনম্মন্যতা ৩১২
৮. রাজনৈতিক অবক্ষয় ৩১৫
৯. কেন্দ্রীয় শক্তির বিভাজন ৩১৬
১০. ত্রুটিপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৩১৬
১১. আব্বাসি খিলাফতের পতনে খ্রিস্টানদের ভূমিকা ৩১৮
১২. আব্বাসি খিলাফতের পতনে মুসলমান শাসকদের ভূমিকা ৩১৯
১৩. যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে অযোগ্যকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান ৩২৪
১৪. আলাবিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ৩২৪
১৫. ভোগবিলাস ৩২৮
১৬. চূড়ান্ত অবক্ষয় ৩৩৬

১৭. অর্থনৈতিক মহাসংকট ৩৩৭
১৮. বাগদাদে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ৩৩৮
১৯. উজির ইবনু আলকামির বিশ্বাসঘাতকতা ৩৩৯
২০. তাতারবাহিনীর রণকৌশল ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের শক্তি ৩৪৯
আট : বাগদাদ পতনের ফল ৩৫০
১. সাহিত্য-সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির বিনাশ ৩৫০
২. বাগদাদের অবনমন : খিলাফতের রাজধানী থেকে নগণ্য শহর ৩৫১
৩. জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় স্থবিরতা এবং আরবি ভাষার গুরুত্ব হ্রাস ৩৫১
৪. বাগদাদ পতনে খ্রিষ্টানদের আনন্দ-উল্লাস ৩৫২
৫. কায়রোকে খিলাফতের রাজধানী নির্বাচন ৩৫৩
৬. শিয়া মতবাদের প্রসার ৩৫৪
৭. মুসলিম উম্মাহর নবশক্তির বিস্ফোরণ ৩৫৫
৮. উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম উসমানের জন্ম ৩৫৫
৯. বাগদাদের পতনে কবিদের শোকগাথা ৩৫৬

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা কেবল আল্লাহর; আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা ও মন্দ কৃতকর্ম থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁদের দুজন থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভয় করো তাঁকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করো; আর সতর্ক থেকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ১]
>
> হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭১-৭২]

হে আমার রব, আপনার মহীয়ান সত্তা আর বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। আপনার প্রশংসা, যতক্ষণ-না আপনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন। আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ও। আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও। সুতরাং মহান আল্লাহর মহীয়ান সত্তাতুল্য প্রশংসা। তাঁর পূর্ণতাতুল্য প্রশংসা। মহত্ত্ব ও বড়ত্বতুল্য প্রশংসা।

আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোতে ধারাবাহিকভাবে নবি, খুলাফায়ে রাশিদিন, উমাইয়া

যুগে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সংঘটিত ক্রুসেড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ক্রুসেডকালীন পূর্ব এশিয়ার মোঙ্গলদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে সেলজুক[১] (Seljuk) ও জিনকি (Zengi) বংশের উত্থান, বীর সিপাহসালার সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এবং চতুর্থ (১২০২-১২০৪ খ্রি.), পঞ্চম (১২১৭-১২২১ খ্রি.), ষষ্ঠ (১২২৮-১২২৯ খ্রি.) ও সপ্তম (১২৪৮-১২৫৪ খ্রি.) ক্রুসেড আক্রমণ-পরবর্তী ইতিহাস বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

মূলত এই গ্রন্থে লাখ লাখ মুসলমানের রক্তপায়ী ও বাগদাদে আব্বাসি খিলাফতের কবর রচনাকারী মোঙ্গলদের উত্থান-পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের যুদ্ধাভিযানের কথা।

মোট চার অধ্যায়ে সেসব আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

আসুন সংক্ষিপ্তাকারে জেনে নেওয়া যাক কোন অধ্যায়ে কী কী আলোচনা এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদজুড়ে রয়েছে মুসলিম দেশগুলোয় মোঙ্গলদের আগ্রাসন, তাদের ইতিহাস অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা, জাতি গঠনের মূল উপাদান, বিভিন্ন গোত্রের পরিচয়, আদি নিবাস, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন, চেঙ্গিস খানের আবির্ভাবের সময় তাদের ক্রম অধঃপতন, অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চেঙ্গিস খান কর্তৃক মোঙ্গল গোত্রগুলোয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা।

তারপর মোঙ্গলদের আগ্রাসন-পূর্ববর্তী মুসলিমবিশ্বের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তখনকার আব্বাসি খিলাফত, মিসর ও শামে আইয়ুবি শাসনব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে পাপাচার ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের বিস্তার—যেমন : গানবাজনা, মদ, জিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব, জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সংসার পরিচালনায় তার মায়ের সংগ্রাম, খানের বিয়ে, মোঙ্গল সম্রাট হিসেবে অভিষেক, 'খান' উপাধি ধারণ, যুদ্ধাভিযান, মোঙ্গল জাতিপুঞ্জকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ও মোঙ্গল সাম্রাজ্য গঠনবিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

তারপর আলোকপাত করা হয়েছে সেসব উপাদানের ওপর, যেগুলো মোঙ্গলীয় মিশন বাস্তবায়নের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তন্মধ্যে চেঙ্গিস খানের

[১] সেলজুক বা সালজুক সুন্নি মুসলমান সাম্রাজ্য, যারা ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য-এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য শাসন করেন। ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে বিশাল এ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন সুলতান তুগরুল বেগ। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। সুলতান মালিকশাহর শাসনামলে এই সাম্রাজ্য অর্ধপৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেলে সেলজুক সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়। বিস্তারিত জানতে পড়ুন কালান্তর প্রকাশিত ড. আলি সাল্লাবির *সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস*।—সম্পাদক।

জীবনচরিত, তার ব্যক্তিত্ব, বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন : তার বীরত্ব, সাহসিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, আত্মমর্যাদা, নিষ্ঠুরতা, পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদের প্রতি আন্তরিকতা, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বোঝা ও সেনাপতিদের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা ও ইয়াসা (Yasa) নামক রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন ইত্যাদি। ইয়াসা সম্পর্কে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের অভিমত ও ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ইয়াসা সংবিধান, মোঙ্গল সম্রাটদের বাণী সংরক্ষণ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বণ্টন, পাশাপাশি সম্রাটের সেবকদের দায়িত্ব বণ্টন এবং সম্রাট কর্তৃক সেনাবাহিনীর বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরও যেসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন : সেনাবাহিনীর প্রতি চেঙ্গিস খানের উপদেশ ও নির্দেশনা, মোঙ্গালদের রণকৌশল ও যুদ্ধের প্রস্তুতিগ্রহণ, বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসকের যোগাযোগ রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালনা-পদ্ধতি, মোঙ্গালদের সমরনীতি ও বিজিতদের সঙ্গে তাদের আচরণ, গুপ্তচরবৃত্তির প্রতি গুরুত্বারোপ, রাষ্ট্রের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মূল্যায়ন ও তাদের থেকে পরামর্শগ্রহণ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রতিবছর কুরিলতাই (Kuriltai) নামে সাধারণসভার আয়োজন, সেই সভায় বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ, তারপর তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং তাদের উন্নত রণকৌশল। সেই সঙ্গে মোঙ্গালদের সামাজিক আচার, রীতিপ্রথা ও অলীক বিশ্বাসগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরিলতাই সভার আলোচনায় নেতৃস্থানীয় সবার উপস্থিতিতে বিভিন্ন মতামত গ্রহণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে নিজেদের লক্ষ্য ও মিশন স্থিরীকরণ এবং তা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট স্ট্র্যাটেজি ও পরিকল্পনা গ্রহণ—ইত্যাদি বিষয়গুলোও উঠে এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ও শেষ পরিচ্ছেদে মোঙ্গালদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের বেদনাবিধুর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সংক্ষেপে খাওয়ারিজমের শাসকদের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। তারপর খাওয়ারিজমি ও আব্বাসি খিলাফতের মধ্যে শত্রুতা, খাওয়ারিজমিদের বিরুদ্ধে মোঙ্গালদের যুদ্ধাভিযানের কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর মোঙ্গালদের বিজয়াভিযানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মা-ওয়ারাউন নাহার[১] (Transoxiana) থেকে মোঙ্গালরা যেসব অভিযান পরিচালনা করে

[১] এটি ট্রান্স-অক্সিয়ানা বা ট্রান্স-অক্সানিয়া নামেও পরিচিত। রোমানরা এই নাম দেয়। মা-ওয়ারাউন নাহার হচ্ছে প্রাচীন নাম। মধ্য-এশিয়ার বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, দক্ষিণ কিরগিজিস্তান ও দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাখস্তানজুড়ে এটি বিস্তৃত ছিল। এর ভৌগোলিক অবস্থান আমু দরিয়া ও সির দরিয়ার মধ্যখানে। — সম্পাদক।

ওতরার (Otrar), জানদ (Jand), বানাকিত (Banākat)[৩], তাজিকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খুজান্দা (কোকন্দ—Khujand), উজবেকিস্তানের বুখারা (Bukhara) ও সমরকন্দে (Samarkand) আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য থেকে পশ্চিমা অঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন করেছিল, সেসব অভিযানের ধারাবাহিক বিবরণ ও সুলতান মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে সুলতানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জালালুদ্দিন মাংবুরনি[৪] কর্তৃক খাওয়ারিজমি বাহিনীর নেতৃত্বগ্রহণ, মোঙ্গালবাহিনী কর্তৃক খাওয়ারিজম শহর অবরোধ ও তার ওপর আধিপত্য বিস্তার-সংক্রান্ত আলোচনা।

তারপর বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসির কর্তৃক খাওয়ারিজমের ওপর দিয়ে নরখাদক মোঙ্গালদের আগ্রাসনের দুঃসহ ও হৃদয়বিদারক বর্ণনা, মোঙ্গালবাহিনী কর্তৃক খোরাসানকে (Khorasan) ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা, বলখে (Balkh) তাদের আধিপত্য বিস্তার, নাসা দখল ও তার অধিবাসীদের হত্যা, মার্বকে (Merv) মৃত্যুপুরীতে পরিণত করা, নিশাপুরবাসী (Nishapur) থেকে প্রতিশোধগ্রহণ, হেরাত (Herat) পদানত করা, গজনি (Ghazni) দখল, সুলতান জালালুদ্দিন মাংবুরনির শেষ পরিণতি ও তাঁর অন্তর্ধানরহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ :

১. সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইসলামি শিক্ষা-সভ্যতার প্রবাহ সৃষ্টিতে খাওয়ারিজমিদের ব্যর্থতা।
২. শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি গণ-অসন্তোষ।
৩. শাসক-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব।
৪. খাওয়ারিজমিদের দুর্বল সমরনীতি।
৫. পার্থিব জীবনের মোহ ও মৃত্যুর ভয়।
৬. অনৈক্য ও অবিচার।
৭. মুহাম্মাদ আলাউদ্দিন খাওয়ারিজমের স্বার্থপরতা ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়।
৮. জালালুদ্দিন মাংবুরনির ব্যক্তিত্বের কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতা।
৯. আব্বাসি খলিফা নাসির লি-দিনিল্লাহর অদূরদর্শিতা।

---

[৩] ইংরেজি বানানে এ অঞ্চলের নাম বানাকাত (Banākat)। তবে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবির মুজামুল বুলদানে এ অঞ্চলের বানানটি 'বানাকিত' রয়েছে। এখানে সে বানানটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। — সম্পাদক।

[৪] মাংবুরনি (Jalaluddin Mangburni) বানানটি বিভিন্নভাবে লিখতে দেখা যায়। আমরা এ বইয়ে 'মাংবুরনি' বানানে নামটি রেখেছি। — সম্পাদক।

১০. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে আলিমদের অনুপস্থিতি।

১১. মোঙ্গালীয় মিশন।

সব শেষে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্বর মোঙ্গলদের হাতে মধ্যযুগের তিলোত্তমা নগরী ও সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যপুরী বাগদাদের পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাগদাদ পতন—এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। অবশ্য এর আগে চেঙ্গিস খানের মৃত্যুপরবর্তী মোঙ্গলদের ধারাবাহিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : চেঙ্গিস খানের প্রতিনিধি শাসকবর্গ, তাদের মধ্যে তার সাম্রাজ্য বণ্টন, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় খান হিসেবে চেঙ্গিস খানের তৃতীয় পুত্র ওগেদাইকে (Ogedei Khan) নির্বাচন, মুসলিম দেশগুলোতে মোঙ্গলদের অব্যাহত আক্রমণ, চীন-ইরান ও মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্য জয়, উত্তর-চীন জয়, পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধাভিযান, ওগেদাইয়ের মৃত্যু, তার সংস্কার ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা, মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে তার আচরণ, তার মৃত্যুর পর মোঙ্গল সম্রাট হিসেবে গুয়ুক খানকে (Güyük Khan) নির্বাচন, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে গুয়ুকের দহরম-মহরম, তার মৃত্যু, মোংকে খানকে (Möngke Khan) মোঙ্গল সম্রাট হিসেবে নির্বাচন, তার অভ্যন্তরীণ সংস্কার, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে তার সমতাপূর্ণ আচরণ, তার সঙ্গে খ্রিষ্টানদের মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মোংকে খান খ্রিষ্টানদের সঙ্গে এই শর্তে মৈত্রীচুক্তি করে যে, মোঙ্গল সম্রাটই হবে বিশ্বের একমাত্র শাসক; বন্ধু রাষ্ট্রগুলো তার অনুগত বিবেচিত হবে, শত্রু রাষ্ট্রগুলোকে সমূলে বিনাশ করা হবে কিংবা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হবে।

এরপর শিয়া ইসমাইলিদের জাতিগতভাবে নিধন ও তাদের শিকড় উৎপাটনে হালাকু খানের তৎপরতা এবং বাগদাদ অভিমুখে মোঙ্গলবাহিনীর অভিযান পরিচালনা, বাগদাদ অবরোধ ও দখল, খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহকে হত্যা, সভ্যতার বিনাশ, তাতারদের হাতে বাগদাদের সুবিশাল গ্রন্থাগার জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

বাগদাদ পতনের পর ইরাকে হালাকু খানের ইলখানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জুওয়াইনির যুগে ইরাকের প্রশাসন, হালাকু খানের কাছে শাসক ও প্রশাসকদের আগমনের বর্ণনাও বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এরপর ইতিহাসের ঘটনাবহুল অধ্যায় আব্বাসি সালতানাতের পতনের মৌলিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে; যেসব কারণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ছিল :

১. প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব।
২. জিহাদবিমুখতা।
৩. রাজনৈতিক অনৈক্য।
৪. আব্বাসি সেনাবাহিনীর দুর্বলতা।
৫. দুর্বল রাষ্ট্রীয় মনোভাব।
৬. অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ।
৭. মুসলমান শাসকদের দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা।
৮. রাজনৈতিক অবক্ষয়।
৯. কেন্দ্রীয় শক্তির বিভাজন।
১০. ত্রুটিপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
১১. আব্বাসি খিলাফতের পতনে খ্রিষ্টানদের ভূমিকা।
১২. আব্বাসি খিলাফতের পতনে মুসলিম শাসকদের ভূমিকা।
১৩. যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে অযোগ্যকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান।
১৪. আলাবিদের (আলি-বংশীয়দের) মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
১৫. ভোগবিলাসিতা।
১৬. চূড়ান্ত অবক্ষয়।
১৭. অর্থনৈতিক মহা সংকট।
১৮. বাগদাদে শাসকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
১৯. শিয়া উজির ইবনু আলকামির বিশ্বাসঘাতকতা।
২০. তাতারদের অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীবাহিনী ও মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের শক্তি।

এরপর বাগদাদ পতনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে :

১. ইসলামি সাহিত্য, সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির বিনাশ।
২. রাজধানী থেকে বাগদাদের সাধারণ শহরের পর্যায়ে নেমে আসা।
৩. জ্ঞানবিজ্ঞানের অধঃপতন ও আরবি ভাষার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলা।
৪. খ্রিষ্টানদের বিজয়োল্লাস।
৫. কায়রোকে খিলাফতের রাজধানী হিসেবে নির্বাচন।
৬. শিয়াদের বিস্তার লাভ।
৭. মুসলিম উম্মাহর শক্তির বিস্ফোরণ ও তাদের ঘুরে দাঁড়ানো।

এসব ঘটনা মুসলমানদের হৃদয়ে গভীর মর্মজ্বালা সৃষ্টি করেছিল। হতাশা, অনুতাপ ও মনস্তাপের অনলে পুড়িয়েছিল তাদের। কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় সেসব মর্মযাতনা করুণরূপে ফুটে ওঠে। শত শত বছরের সাধনায় মুসলমানরা যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তার এমন সকরুণ পতন দেখে তারা তাদের ধরে রাখতে পারেননি। ফলে তারা নিজেদের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। অসংখ্য শোকগাথা রচনা করেন। এসব শোকগাথায় তাদের অন্তর্যাতনা, হতাশা ও দুঃখবোধের কথা করুণ সুর হয়ে বাজে। কুফার বিখ্যাত কবি শামসুদ্দিন এমনই একটি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন,

তোমাদের বিচ্ছেদে আমি সত্যিই মর্মাহত।
জানি না আর কতকাল তোমাদের কারণে আমাকে তিরস্কার
ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হবে।

এর তিনটি পঙ্‌ক্তির পর তিনি বলেন,

আমার মতো তুমিও যদি প্রিয়জনদের হারিয়ে থাকো;
কিংবা তোমার হৃদয়েও যদি প্রেমযাতনা সৃষ্টি হয়ে থাকে,
তাহলে পরিত্যক্ত এই জনপদে দাঁড়িয়ে জনপদকে সম্বোধন করে বলো,
হে জনপদ, কালের দুর্যোগ তোমার এ কী হাল করেছে!

শেষ পঙ্‌ক্তিতে তিনি বলেন,

আল্লাহর শপথ, এই বিচ্ছেদ আমি স্বেচ্ছায় বরণ করিনি;
বরং কাল আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে ১৪৩০ হিজরির ২৮ মুহাররাম—২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি রবিবার রাত ৮টা ১০ মিনিটে, ইশার সালাতের পর। গ্রন্থ রচনার এই শেষ পর্যায়ে এসে আমি আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করছি। তিনি যেন আমার এ কাজটুকু কবুল করে নেন এবং তাঁর বান্দাদের বক্ষকে উন্মুক্ত করেন, যাতে তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে এবং আপন দয়া, অনুগ্রহ ও মহানুভবতায় এতে বরকত দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করতে চাইলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং কোনো অনুগ্রহ রুদ্ধ করতে চাইলে কেউ তা উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির : ২]

আমি আমার মহান স্রষ্টা ও প্রভুর সামনে বিনয়াবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুগ্রহ, বদান্যতা ও মহানুভবতার কথা স্বীকার করছি। আমার কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। আমি আমার তৎপরতা, স্থবিরতা ও জীবন-মৃত্যুর সর্বক্ষেত্রে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমার

মহান স্রষ্টা আল্লাহই আমার ওপর অনুগ্রহকারী। তিনিই আমাকে সাহায্যকারী। আমার মহান ইলাহই আমাকে তাওফিক দানকারী। তিনি যদি আমার থেকে দূরে সরে যান এবং আমাকে আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও নাফসের হাতে সোপর্দ করেন, তাহলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে যাবে, স্মৃতিভ্রষ্ট হবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে পড়বে, অনুভূতিশক্তি হারিয়ে যাবে, আমি আবেগশূন্য হয়ে পড়ব এবং আমার কলম তার লেখার শক্তি হারাবে।

আল্লাহ, আমাকে কেবল আপনার সন্তোষজনক বিষয় দেখান এবং সে জন্য আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আমাকে আপনার অপছন্দনীয় বিষয় থেকে দূরে রাখুন। শুধু আমাকে নয়, আমার চিন্তাশক্তি ও অন্তরকেও সেগুলো থেকে দূরে রাখুন। আমি আপনার সমুচ্চ গুণাবলি ও উত্তম নামসমূহের অসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার এ কাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কবুল করুন, আপনার বান্দাদের জন্য এটিকে উপকারী বানান, আমাকে এর প্রতিটি বর্ণের বিনিময় দান করুন এবং এর মাধ্যমে আমার নেকির পাল্লা ভারী করুন। সর্বোপরি যে-সকল ভাইবন্ধু কাজটি শেষ করতে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, যারা না থাকলে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তাদের সবাইকে আপনি উত্তম প্রতিদান দিন।

যারা গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমার প্রত্যাশা, তারা মহান আল্লাহর কাছে রহমত, মাগফিরাত ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করার সময় আমাকেও তাদের দুআয় অন্তর্ভুক্ত রাখবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফিক দিন, যা আপনি আমার পিতা-মাতা ও আমাকে দান করেছেন এবং আমাকে আপনার পছন্দমতো নেক আমল করার তাওফিক দিন। আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সূরা নামল : ১৯]

মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ভূমিকা শেষ করছি,

> আল্লাহ, আপনি আমাদের ও পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। [সূরা হাশর : ১০]

মহান রবের ক্ষমা, করুণা ও সন্তুষ্টির ভিখারি—

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি

২৮ মুহাররাম ১৪৩০—২৫ জানুয়ারি ২০০৯

প্রথম অধ্যায়

মোঙ্গালীয় মিশন ও মুসলিমবিশ্বে মোঙ্গাল আগ্রাসন

- মোঙ্গাল ইতিহাসের সূচনা
- চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব
- মোঙ্গালদের হাতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙ্গাল ইতিহাসের সূচনা

এক. মোঙ্গাল-ইতিহাস অধ্যয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী মোতাবেক খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এশিয়া মহাদেশে যেসব সভ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল এবং যাদের ইতিহাসের একটি পর্যায় মোঙ্গাল ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত ছিল, নিঃসন্দেহে একজন ইতিহাসবিদের জন্য সেসব জাতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করাটা সহজ। কিন্তু একজন ইতিহাসবিদ যখন মোঙ্গালদের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে যায়; কিংবা একজন ইতিহাস-পাঠক যখন তাদের সম্পর্কে প্রকৃত বিষয় জানতে চায়, সঠিক ইতিহাস অধ্যয়ন করতে চায়, তখন তাকে সত্যিই দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। অনেক কঠিন সমস্যা ও বাধার মুখোমুখি হতে হয়। কেননা, মোঙ্গালরা ছিল গ্রাম্য ও যাযাবরশ্রেণির মানুষ। তাদের বসবাস ছিল ১৫০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তীর্ণ এশিয়ার বিখ্যাত গোবি মরুভূমিতে (Gobi Desert); যেখানে উত্তপ্ত বালি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই খাদ্যের সন্ধানে প্রায়ই তাদের জায়গা বদল করতে হতো। প্রতিকূল পরিবেশ ও বৈরী আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। ফলে তাদের জীবনযাত্রা কখনো সুবিন্যস্ত ছিল না। তাই তাদের প্রাথমিক ইতিহাসে ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ইতিহাস এমন অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল যে, তার ভেতর থেকে বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করা অত্যন্ত দুরূহ। অথচ একজন ইতিহাসবিদের জন্য মোঙ্গালদের বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির মধ্যে যে মৈত্রীচুক্তি ছিল, তা জানতে অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ ও অব্যাহত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যকার ধারাবাহিকতা খুঁজে বের করা আবশ্যক।

মোঙ্গালদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহে ধারাবাহিকতা না থাকায় এবং সেগুলো সুবিন্যস্ত না হওয়ায় ইতিহাসবিদদের পড়তে হয় বিভ্রান্তিতে। গবেষণা ও অধ্যয়ন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। তা ছাড়া তাদের প্রাথমিক ইতিহাসকে ঘিরে যেসব রহস্য, বিভ্রান্তি ও বানোয়াট কল্পকাহিনির ছড়াছড়ি রয়েছে, তা

সত্যিকারার্থেই তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন ও তাদের নিয়ে গবেষণার পথকে রুদ্ধ করে। আর এমনটি মূলত মোঙ্গালদের ওপর লিখিত নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা এবং পূর্ববর্তী ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্তের স্বল্পতার কারণে হয়েছে।[৫]

গবেষক ও পাঠকদের জন্য মোঙ্গল ইতিহাস কঠিন হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, তাদের আবাসভূমির বিস্তৃতি। তারা বসবাস করত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। মরুচারী যাযাবর হওয়ার কারণে তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট কোনো এলাকা ছিল না। এক স্থানে তারা বেশি দিন থাকত না। আঞ্চলিক কোনো সীমানা তারা মানত না। আর সে কারণে তাদের ইতিহাসের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করা যায় না। বাধ্য হয়ে তখন একজন গবেষক ও পাঠককে তাদের প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর ঘটনাবলির প্রতি প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখতে হয় এবং সেগুলো সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়।

তারা ছিল দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ জাতি। এই দুঃসাহসিকতাই বিস্তীর্ণ মরুভূমি, দুর্গম পাহাড়, উত্তাল নদী, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, প্রতিকূল আবহাওয়া এবং ক্ষুধা ও মহামারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের বেঁচে থাকার শক্তি জুগিয়েছিল। খাবার না থাকলে টানা কয়েক দিন তারা না খেয়ে থাকতে পারত। ঘোড়ায় চড়ে দিনরাত একটানা ছুটতে পারত। উলটো করে বললে বলা যায়, পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিকূলতাই তাদের দুঃসাহসী করে তুলেছিল। ফলে কোনো বিপদই তাদের কাছে বিপদ মনে হতো না এবং কোনো বাধাকেই তারা বাধা মনে করত না।

তারা ছিল হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর ও নৃশংস জাতি। উদারতা, কোমলতা ও দয়ার্দ্রতার কোনো লেশ তাদের অন্তরে ছিল না। তারা নিরক্ষর ও মূর্খ জাতি ছিল। তাই শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কোনো মূল্য তাদের কাছে ছিল না। এসবের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কও ছিল না।

তাদের মন যে দিকে ছুটত, সবাই মিলে সে দিকেই ধাবিত হতো। কত হাজার দুর্গ এবং জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরী মাত্র এক রাতের ব্যবধানে তাদের ভয়াল কালো থাবায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তার হিসাব কে রেখেছে? তারা রক্ত-আগুনের খেলা খেলে যাওয়ার পর বিভিন্ন শহর ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে একধরনের স্থিরতা ও শান্তভাব বিরাজ করত। বাস্তবে তা এমন কোনো শান্তভাব ছিল না, যা যুদ্ধবিগ্রহ দেখতে দেখতে ক্লান্ত ও নতুন করে সভ্যতার সুফল ভোগ করতে আগ্রহী জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়; বরং তা ছিল তাদের অন্তিম ও শেষ নিশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত।[৬]

---

[৫] আল-মুগুল, সাইয়েদ বাজ আল আরিনি : ২১।

[৬] প্রাগুক্ত : ২৪।

মোঙ্গল ইতিহাসের প্রতি গবেষকদের আগ্রহের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, তা খুব বিশদ ও কঠিন। এর জন্য অবশ্য বিস্তর গবেষণা, প্রচুর অধ্যয়ন ও প্রখর অনুসন্ধানী চোখের প্রয়োজন, যা প্রকৃত ইতিহাস-গবেষককে গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে আগ্রহী করে তোলে। কেননা, চূড়ান্ত পরিশ্রম করে ইতিহাসের অচেনা-অজানা গলিপথ ঘুরে গবেষণা ও অধ্যয়নের যে প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয় এবং তা থেকে যে ফল আহরণ করা হয়, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও তৃপ্তিদায়ক হয়।

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, মোঙ্গলরা রাশিয়া, হাঙ্গেরি ও সাইলেশিয়ায় (Silesia) আক্রমণ করে। ইউরোপেও একাধিকবার আক্রমণ করে। যেহেতু খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে ক্রুসেডে লিপ্ত ছিল; আর গির্জার স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ধর্মযাজকদের সঙ্গে শাসক ও জনগণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল, তাই এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মোঙ্গলরা সহজেই ইউরোপ আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপের পরিস্থিতিই তাদের সামনে ইউরোপ আক্রমণের পথকে সুগম করেছিল।

অবশ্য মোঙ্গলদের এ যুদ্ধাভিযান ইউরোপ ও সিরিয়াবাসীর জন্য একদিক থেকে শাপে বর হয়েছিল। কেননা, ইউরোপ ও সিরিয়াবাসী তখন অ্যাসাসিনদের[১] অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। অ্যাসাসিনরা দিনে দিনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিহত করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান মোঙ্গলবাহিনী নিয়ে এসে তাদের ধ্বংস করে। সমস্ত দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। সর্বত্র তাদের ধ্বংসের চিহ্ন লেগে থাকে।

মোঙ্গলরা তখন এমন শক্তিধর দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হয় যে, তাদের নাম শুনলেই ইউরোপীয়দের ঘাম ছুটত। থরথর করে কাঁপত তারা। ইউরোপীয়রা তাদের মোকাবিলা করতে অক্ষম ছিল। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ যদি তাদের অপ্রতিরোধ্য জয়রথ থামিয়ে না দিতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে পশ্চিম-ইউরোপের বিশাল একটি অঞ্চল তারা হজম করে ফেলত।

---

[১] 'হাশিশিয়িন' ও 'হাশাশিন'—শব্দগুলো হাশিশ নামক একপ্রকার মাদকখোর গুপ্তঘাতকদের এ নামে ডাকা হতো। হাশিশ তৈরি হতো ক্যানাবিস স্যাটিভা নামক পাহাড়ি গাছের বাছাই করা কালচে-বাদামি রঙের ফুলের আঠা দিয়ে। শণের মতো এই গাছের শুকনো পাতা হচ্ছে ভাং বা সিদ্ধি এবং কাঁচা পাতা ও ফুলের রস শুকিয়ে বড়ি বানিয়ে তৈরি হয় চরস। ক্রুসেডের সময় হাশাশিনরা সুন্নি মুসলমানদের গুপ্তহত্যায় মেতে ওঠে। যাওয়ার সময় তারা প্রচুর হাশিশ খেয়ে নিত। তাই তাদের আরবি ভাষায়, 'হাশাশিন' বা হাশিশখোর বলা হতো। এ থেকেই ইংরেজি শব্দ Assasin (অ্যাসাসিন)-এর উৎপত্তি।

এরা ছিল পেশাদার গুপ্তঘাতক। ইসমাইলি শিয়া মতবাদের অনুসারী এই গুপ্তঘাতকরা ইতিহাসে অ্যাসাসিন, হাসানি, ফিদাইন নামে পরিচিত। ইসমাইলিয়্যাহ, বাতিনিয়্যাহ (আকিদা-বিশ্বাস গোপনকারী), তালিমিয়্যাহ (গুপ্তহত্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত), মুলাহিদা (ধর্মত্যাগী)-সহ আরও নানা নামে এরা পরিচিত ছিল। অবাক করা তথ্য হলো, এদের প্রতিষ্ঠাতা একজন মুফতি। যে কিনা আবার জগদ্‌বিখ্যাত এক আলিমের শিষ্যও। তার নাম হাসান ইবনু সাব্বাহ।—সম্পাদক।

অবশ্য এশিয়ার মুসলমানদের তুলনায় ইউরোপের খ্রিস্টানরা মোঙ্গালঝড়ের খুব সামান্য তাণ্ডবই প্রত্যক্ষ করেছে। বলা যায়, মোঙ্গালঝড় প্রায় পুরোটাই এশিয়ার মুসলমানদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। তারা মোঙ্গালদের ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতার সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে। যেমন : পশ্চিম-এশিয়ায় মোঙ্গালরা বাগদাদ ধ্বংস করে। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান আব্বাসি খিলাফতের পতন ঘটায়। চীনের কিন (Kin)[৮] বংশকে উৎখাত করে। এই কিন বংশের লোকেরা প্রাচীনকালে চীনের উত্তরাঞ্চল শাসন করত। এ ছাড়াও মোঙ্গালরা চীনের দক্ষিণাঞ্চল, খাওয়ারিজম, পারস্য ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে অভিযান চালায়। এমনকি হিন্দুস্থানেও মোঙ্গাল শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

এসব ঘটনা থেকে যেকোনো একটি ঘটনাই মোঙ্গালদের ইতিহাস অধ্যয়নের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, যখনই কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির পতন ঘটে, তখনি ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে বিশাল আন্দোলনের সূচনা হয়। মানবতার প্রাণের স্পন্দন জেগে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ গ্রিকদের ওপর পারসিকদের আধিপত্য বিস্তারের পর শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেখানে বিশাল বিপ্লব সূচিত হয়। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর উসমানিরা আধিপত্য বিস্তারের পর সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মানুষের অভিনিবেশ বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগে মুসলমানদের হাতে স্পেন বিজিত হওয়ার পর ইউরোপে প্রথম জ্ঞানবিজ্ঞান, চিকিৎসা, দর্শন ও সাহিত্যের আলো পৌঁছায়। মোঙ্গালদের ইতিহাসেও এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন : বাগদাদ পতনের পর হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার মিসরে স্থানান্তরিত হয়। সে সময় আলিম, বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ মুসলিমবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা যেসব অঞ্চলে যান, সেখানে পরবর্তীকালে বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ-পরীক্ষাকেন্দ্র বাগদাদ থেকে মিসরের কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয়। এভাবে পশ্চিমারা মুসলমানদের শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও চিন্তা-দর্শন অর্জনের সুযোগ লাভ করে।[৯] ক্রুসেডের সময় তারা এগুলো দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছে। মুসলমানদের জ্ঞানকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকেও মোঙ্গালদের উত্থানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা হয়; যেহেতু তাদের উত্থানে এশিয়ায় অনেক ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হলো, মোঙ্গাল প্রশ্নে এশিয়াবাসীর ঐক্য গড়ে ওঠে। তারা সবাই তখন একজোট হয়। তবে এটা রাজনৈতিক কিংবা জাতিগত কোনো ঐক্য ছিল

[৮] এ বংশের সর্বাধিক প্রচলিত নামটি হলো জুরচেন জিন (Jurchen Jin)। তবে তাদের আরও কয়েকটি নামে পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন : কিন বংশ (Kin Dynasty), জিন বংশ (Jinn Dynasty)। লেখক এই গ্রন্থে উক্ত বংশের আলোচনায় 'কিন' শব্দটা আনায় আমরা পুরো গ্রন্থে এ বানান রেখেছি।—সম্পাদক।

[৯] আল-মুগুল, সাইয়িদ বাক্স আল আরিনি : ২৬।

না। কেননা, এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা মূলত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এই ঐক্যের তাৎক্ষণিক কোনো সুফল তারা লাভ করতে পারেনি। কেননা, মোঙ্গলরা শুধু যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা নয়; বরং সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। পথঘাট ছিল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। মুসাফির নিরাপদে সফর করতে পারত। তবে যাত্রাপথে কেউ কোনো মোঙ্গল শাসকের লাশবহরের মুখোমুখি হলে লাশ বহনকারীরা তাকে সেখানেই মেরে ফেলত। তাদের পথে আসা প্রত্যেককে হত্যা করত।

ধর্মীয় উদারতার জন্য মোঙ্গলরা বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এটি ছিল তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এটিকে তাদের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হলেও মূলত এর পেছনে যে কারণটি সক্রিয় ছিল তা হচ্ছে, ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহ ও উদাসীনতা। ধর্মকে তারা তেমন একটা গুরুত্ব দিত না; উপেক্ষা করে চলত। তাদের এই উদারতার সুদৃঢ় কোনো মানদণ্ড ছিল না। ধর্ম যাতে স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সে জন্য তারা ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতার পরিচয় দিয়েছিল। সব ধর্মের শাসক ও সম্পদশালীদের থেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই উদারতা তাদের বেশ কাজে লেগেছিল।

দুই. মোঙ্গলদের পরিচয়

বিশ্ব-ইতিহাসের মঞ্চে মোঙ্গলদের উত্থান ঘটেছিল হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী মোতাবেক খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। এরপর হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশক মোতাবেক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা বিশ্বপরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিজেদের ভূখণ্ডের বাইরেও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রথম ও শেষ দৃষ্টান্ত এই মোঙ্গলরাই স্থাপন করেছে। মাত্র তিন দশকে বিশ্বপরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয় তারা। তাদের এই বিশাল সাম্রাজ্য পূর্ব-জাপানি দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যভাগ পর্যন্ত এবং উত্তরে সাইবেরিয়া ও বাল্টিক সাগর থেকে শুরু করে দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মোঙ্গল ও তাতাররা অভিন্ন নাকি ভিন্ন জাতি

পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদগণ, বিশেষত আরব ইতিহাসবিদরা এবং যারা মোঙ্গলদের উত্থান ও মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধাভিযান প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের মতে মোঙ্গল

ও তাতাররা ভিন্ন কোনো জাতি ও সম্প্রদায় নয়; বরং তারা এক ও অভিন্ন। পরবর্তী ইতিহাসবিদরা, এমনকি আমাদের সমকালীন অনেক ইতিহাসবিদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন; অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল মত। এই ভুল যে শুধু আরবের মুসলিম ইতিহাসবিদরাই করেছেন তা নয়; বরং পাশ্চাত্যের অনেক ইতিহাসবিদ ও পর্যটক এই ভুলের শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের পূর্ববর্তী ইতিহাসবিদরা। তবে পশ্চিমা বড় বড় গবেষক ও প্রাচ্যবিদ—যেমন : রাশিয়ান দুই গবেষক এমিল ব্রেট্শ্নাইডার (Emil Bretschneider) ও ভাসিলি বারটোল্ড (Vasily Bartold), জার্মান ঐতিহাসিক সোলজার, ইংরেজ ইতিহাসবিদ জে. অ্যাভ্রু বয়েল (J. A. Boyle)-সহ আরও অনেকে মোঙ্গল ও তাতারদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

মুসলিম ইতিহাসবিদ রাশিদুদ্দিন আল উজির মূলত এটিই লিখেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *জামিউত তাওয়ারিখ-এ* যা লিখেছেন, পাশ্চাত্যবিদরা তার সাহায্য নিয়েছে। তারপর যে-সকল চীনা ইতিহাসবিদ মোঙ্গলদের ইতিহাস রচনা করেছেন এবং তাদের যেসব গ্রন্থ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে—যেমন : রুশ, জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজি; সেগুলোর মধ্যেও এই পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া মোঙ্গলীয় ভাষায় মোঙ্গলদের ইতিহাস নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক প্রাচ্যবিদ হয়তো সেসব গ্রন্থ থেকে জেনেছেন। আর এ তথ্যটি মৌলিকত্ব পেয়েছে *আত-তারিখুস সিরারিয়্যা লিল মুগুল আও তারিখুল মুগুলিস সিরারিয়্যা* নামক গ্রন্থে। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, মোঙ্গল ও তাতার ভিন্ন দুটি জাতি। তবে উভয় জাতির মধ্যে পরিচয়গত একটি যোগসূত্র থাকতে পারে। সংক্ষেপে আমরা কথাটি এভাবে বলতে পারি, তাতার মানেই মোঙ্গল; কিন্তু মোঙ্গল মানেই তাতার নয়। তাতার মোঙ্গলদেরই একটি শাখা; তবে মোঙ্গলরা তাতারদের শাখা নয়। মোঙ্গলরা হলো উৎসমূল; তাতাররা নয়। সকল তাতারের মধ্যে মোঙ্গলদের রক্ত থাকলেও সকল মোঙ্গলীয়ের মধ্যে তাতারদের রক্ত নেই। যদিও মোঙ্গলদের থেকে তাতারদের বংশবিস্তার লাভ করেছিল, তারা মোঙ্গলদের শাখা ছিল, তবে এ কথা সত্য যে, তাতাররা একটি পৃথক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে এবং সুদীর্ঘকাল মোঙ্গলদের শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমরা এখন যে সময়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা ছিল মোঙ্গলদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। তারা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে একত্রিত হয়। চেঙ্গিস খান তাতারদের পরাজিত করে। তাদের পুরুষদের হত্যা করে। নারী ও শিশুদের বন্দি করে তাদের দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে চেঙ্গিস খানের হাতে তাতাররা একরকম ধ্বংস হয়ে যায়। মোঙ্গলরা তাদের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করে। দলে দলে মানুষ চেঙ্গিস খানের নেতৃত্ব মেনে নিতে থাকে। এভাবে একসময় মোঙ্গলরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করে; ইতিহাসে যা মোঙ্গল সাম্রাজ্য নামে পরিচিত—এটি তাতার সাম্রাজ্য নয়।[১০]

তিন. মোঙ্গলদের আদিবাস

মোঙ্গলরা মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত। তাদের এই আবাস পশ্চিমে সাইহুন (Syr Darya) ও জাইহুন নদী (Amu Darya) থেকে পূর্বে চীনের পার্বত্য সীমান্ত এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোনো কোনো সম্রাট তাদের এই বসবাসের সীমানা বিস্তৃত করে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic Sea)[১১] পর্যন্ত নিয়ে যায়। তবে মঙ্গোলিয়ার পার্বত্য এলাকা, তিয়ানশান ও আলতাই পর্বতমালা (Tian Shan and Altai Mountains) এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সমভূমি, গোবি মরুভূমি, বৈকাল হ্রদ (Lake Baikal) ও সে অঞ্চলের অন্যান্য নদীর তীরবর্তী চারণভূমিই ছিল তাদের প্রধান আবাস-অঞ্চল। এসব অঞ্চলেই সাধারণত তারা বসবাস করত। অবশ্য শীতকালে বিভিন্ন পর্বতশ্রেণিতে অবস্থিত সমভূমি ও উষ্ণপ্রধান এলাকায় বসবাস করা পছন্দ করত। কারণ, শীতের মৌসুমে সেখানে পশুর খাবারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। অনেক ঘাস ও লতাপাতা জন্মাত। গ্রীষ্মকালে দু-তিন মাসের জন্য তারা উঁচু ভূমি ও পাহাড়ের উপরে চলে যেত। সেখানের আবহাওয়া তখন শীতল হতো এবং খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।

সমুদ্র থেকে এই অঞ্চলগুলোর দূরত্ব, পাশাপাশি উচ্চতা এর জলবায়ু পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। এখানকার বেশির ভাগ অঞ্চলে সাধারণত তাপমাত্রা শূন্যের ওপর ৩৮ ডিগ্রি অথবা শূন্যের নিচে ৪২ ডিগ্রিতে নেমে আসত। ফলে বছরের অধিকাংশ সময় নদনদী ও হ্রদের পানি জমে বরফ হয়ে থাকত। উপরন্তু উত্তরে অবস্থিত সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রায়শই শৈত্যপ্রবাহ প্রবাহিত হতো; কিন্তু গ্রীষ্মকালে দেখা যেত এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। তখন বেড়ে যেত তাপমাত্রা। আবহাওয়া হয়ে উঠত অনেক উষ্ণ। ধেয়ে আসত ধূলিঝড়। সামান্য পানির জন্য তারা গোবি মরুভূমি ছুটে বেড়াত। গোবি নামের অর্থ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। তারা পশুর খাদ্যশস্যের জন্য পাহাড়-পর্বতে অবস্থিত উঁচু-নিচু বিভিন্ন উপত্যকা চষে বেড়াত। খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে গবাদি পশুর খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিলে সেগুলো নিয়ে তারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলে যেত। যেহেতু তাদের নিকট প্রচুর গবাদি পশু থাকত, তাই সেগুলোকে বাঁচানোর জন্য বাধ্য হয়ে তাদের এমন করতে হতো।

---

[১০] *সুকুতুত দাওলাতিল আব্বাসিয়া* : ৫৪।

[১১] অ্যাড্রিয়াটিক সাগর ভূমধ্যসাগরের সর্ব-উত্তরের একটি জলবাহু, যা দক্ষিণ ইউরোপে ইতালির পূর্বে ও বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এর উপকূল ঘিরে যে কয়টি দেশ রয়েছে, তা হলো—ইতালি, আলবেনিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো ও স্লোভেনিয়া।—সম্পাদক।